—:: সামাজিক আচার ::—

।। বিবাহ ।।

বৈদিক বিবাহ সামাজিক প্রথারূপে স্বীকৃত হবার বহু পরে ও পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে বলপূর্বক হরে বিবাহ ও কন্যা অপহরণ পূর্বক বিবাহ মেচ জাতির মধ্যে অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু বিবাহ প্রথা মানুষকে পশুত্বের হাত থেকে রক্ষা করেছে। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা এনেছে। বিবাহ - অনুষ্ঠান সেই কারনেই অন্যান্য অঞ্চলের মত এতদঞ্চলেও কল্যাণমূলক নীতি বিধান রূপে স্বীকৃত। তাই বর্তমানে অসামাজিক বিবাহে শাস্তির পরিমান আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। কারণ বিবাহ এখন আর স্ত্রী পুরুষের মিলন জনিত আনন্দদায়ক প্রথা নয়, —বিবাহিত পুরুষ ও রমনী সমাজের নীতি বিধানের প্রতিপালক—পালিকা।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপনের পূর্বে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং এবং গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থান কারী রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবাহ কামরূপ অঞ্চলের ব্রাহ্মনদের দ্বারা নিষ্পন্ন হত। যাঁরা সামবেদকে অনুসরণ করতেন, তাঁদের সামবেদীয় এবং যাঁরা যজুর্বেদকে অনুসরণ করতেন, তাদের যজুর্বেদীয়
যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হত। এই দুই শ্রেনীর মধ্যে যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল অধিক এবং অধিকাংশ বিবাহ তাঁদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হত। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের অধিকার যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মনদের উপর ন্যস্ত ছিল বলেই এতদঞ্চলের পুরোহিতকে বলা হয় = 'অধিকারী'। যত দূর মনে হয়, শব্দটি 'অধিকার' থেকেই এসেছে।** "পূর্বে জামদগ্নের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়গণ ম্লেচ্ছের ছদ্মবেশে ধারন করার জন্য ব্রাহ্মণ-রহিত হয়। ছদ্মনাম রাজবংশী ধারী পতিত ক্ষত্রিয়গণ নিরুপায় হইয়া তাহাদের মধ্যেই যাঁহারা নিষ্ঠাবান তাহাদিগকে পূজা অর্চনার ভার অর্থাৎ অধিকার দেওয়া হইল। অধিকার দেওয়া হইল হেতু ইঁহাদিগকে অধিকারী বলা হইয়া থাকে। রাজবংশী ক্ষত্রীয় সমাজের মধ্যে অদ্যাবধি অধিকারী দ্বারা পূজা অর্চনা করা হইয়া থাকে।"[১]

এরা যজুর্বেদের 'গৃহ্যসূত্র' অনুসারে প্রচীন সংস্কার যেমন অন্নপ্রাশন, নামকরন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন। যজুর্বেদের গৃহসূত্রগুলি হিন্দুর কর্মজীবনে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু শুধু মাত্র সূত্র হিসেবে সেগুলি যজুর্বেদে সন্নিবেশিত হয়েছে বলেই সংস্কার কর্মের অঙ্গগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে কিছু জানা যায় না। নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ হিন্দুজাতির বিবাহ কর্মের একটি অঙ্গ বিশেষ। কিন্তু এর বিশদ বিবরণ যজুর্বেদের গৃহ্যসূত্রে আমরা পাই না। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাপন্ডিত পশুপতি

যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণদের জন্য দশকর্ম পদ্ধতি রচনা করে এর অভাব অনেকখানি পূরণ করেছেন।

(১) কোচবিহার জেলার বিত্তবান রাজবংশী দের অনেকে পণ্ডিত পশুপতি - কৃত পদ্ধতিতে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন।

(২) গোয়ালপাড়া ও কুচবিহারের কোনো কোনো স্থানে পঞ্চানন্দ কৃত দশকর্মা পদ্ধতির প্রচলন আজ ও বিলুপ্ত হয়নি।

(৩) রামদত্ত কৃত যজুর্বেদীয় পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ অল্প সংখ্যক রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে।

(৪)ভবদেব ভট্ট কৃত সামবেদীয় বিবাহ পদ্ধতি কুচবিহার ও গোয়ালপাড়া জেলায় কখন ও কখন ও চোখে পড়ে।অবশ্য সামবেদীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যন্ত কমে এসেছে। গোয়াল পাড়া জেলায় এখন আর সামবেদীয় ব্রাহ্মণ বড় বেশী চোখে পড়ে না। এঁদের স্থান দখল করেছেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রাজবংশী, মেচ, রাভা প্রভৃতিদের বিবাহ সম্পন্ন করেন :-

(১) মৈথিলি ব্রাহ্মণ

(২) মহারাজ নরনারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ

(৩)রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ

(৪) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ

(৫) দেউরী বোদো বা ওঝা

(৬) অধিকারী।

বিবাহকে আলোচ্য অঞ্চলে বলা হয়' কইন্যা - জুরা'বা 'কইনা - জুরা'। জলপাই গুড়ি জেলা সদর শহরের ১৪ মাইল পশ্চিমে মাবিয়ালি গ্রামে মনসা মঙ্গলের একটি হস্তলিখিত পুঁথিতে "কৌনা - জোরা" পদটির উল্লেখ রয়েছে।'লখাই'বা লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে বিবাহ স্থির হলে চম্পক নগরের শ্রেষ্ঠী চন্দ্রধর পুত্রের বিবাহের জন্য তৈরী হলেন -

"কানাই পাইয়া সাধুর আনন্দিত মন।
কৌনা জুরিবারে সাধু করিল গমন॥"

কন্যা শব্দের প্রকৃত অর্থ যদিও মেয়ে, তবু ও বিবাহ যোগ্যা মেয়ে বোঝাতে শব্দটি এতদঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। অবিবাহিতা নারীই হল বিবাহের উপযুক্ত কন্যা যার বয়স সাত থেকে সাতাশ হতে পারে। তবে মেয়ে বারো বছরে পড়লে পিতার'কন্যাকাল'উপস্থিত উপস্থিত হয়। কন্যাকাল অর্থাৎ কন্যার কারনে বিপদ।

কন্যাকে যখন স্বামীর সঙ্গে মিলিত করে দেওয়া হয়, তখন সেই মিলনকে বলা হয় 'জুড়া'। পাত্রস্থ হবার আগে বিবাহের উপযোগী দ্বাদশ থেকে ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যাকে বলা হয় 'আকয়ারী'। ষোলো বছর পার হলে সে হয় 'গাভুর চেঙ্গেরী'। 'জুড়া' বা বিবাহ শেষে তাকে বলা হয় 'গিস্থানী', 'নওদা রী' বা 'পরঘরী'। এই সময় তারা আর 'কইন্যা' থাকে না। সুতরাং 'কইন্যা' শব্দটি কুমারী বয়সের একটি বিশেষ অবস্থায় বা Stage এ প্রযুক্ত হয়। উল্লেখ্য, কুড়ি বছর আগে ও মেচদের মধ্যে তেইশ থেকে সাতাশ বছরের ছেলে ও উনিশ থেকে বাইশ বছরের ছেলে মেয়ের বিয়ে হত। এখন ছেলে আঠারো বছরে পড়লেই অধিকাংশ অভিভাবকেরা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। অনুরূপ ভাবে মেয়েদের বয়ঃ সীমা পনেরো হলেই কন্যাপক্ষীয় অভিভাবক কন্যাকে পাত্রস্থ করার চেষ্টা শুরু করেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে আসেন 'কারোয়া' বা 'বাড়ী খাটা ও' এঁদের বৃত্তিকে বলা হয় 'কারুয়া গিরি'। পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধে বা মিলনের দায়িত্ব অর্থাৎ ঘটকালিই এঁদের পেশা। আজকাল শুধুমাত্র কারোয়া গিরি বা কারুয়া বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হয় না। কাজেই অধিকাংশ কারোয়া গিরি বা কারুয়া কৃষিকে জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় বলে মেনে নিয়েছেন। ফলে অতীতে যে বৃত্তি ছিল প্রধান, তা আজ মূলচ্যুত হয়েছে, অথবা বলা যায়, গৌণ স্থান অধিকার করেছে। সমাজে কারুয়া - নির্দিষ্ট পাত্র -পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হলেও কখনও কখনও আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হয়। সাধারনতঃ এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে রাজবংশীদের সঙ্গে রাভা অথবা মেচদের বিবাহ কখনও কখনও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গারো বা কুকীদের সঙ্গে রাজবংশী, রাভা বা মেচদের বিবাহ সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।

পাকা কথা দেবার আগে পাত্র পক্ষের এক বা একাধিক প্রতিনিধি 'কইনা দেখিবা - যাওয়া' কাজটি সমাধা করেন। জলপাই গুড়ি জেলার মাবিস্থানী গ্রামে প্রাপ্ত একটি মনসা মঙ্গলের পুঁথিতে পুঁথিতে দেখা যায়, চাঁদ সদাগর পুত্রের বিবাহের জন্য উপযুক্ত কন্যার খোঁজে নিজেই বের হয়েছেন। -

ওই সাধু যায় রে
ওকি ওরে বানিয়া যায় কি
ওরে সাধু যায় রে হে
বধূ বরিতে সাধু যায় রে ॥
পূর্ব না শহরের কন্যা কি বলিব আর।

পূর্বে না শহরের কন্যা কি বলিব আর ।
অবিভার কলঙ্ক হইছে সাতরার ॥
সাধু বলে হই আমি লক্ষের সদাগর ।
এমন কন্যা বিবায় না দিব লক্ষ্মীন্দর ॥
উত্তর রাজ্যে কন্যা নামে মনাই ।
দুই গালে সলিতা সমান নাকের উদ্দেশ্য নাই ॥
সাধু বলে হই আমি লক্ষের সদাগর ।
পশ্চিম রাজ্যের কন্যা নামে মনোহর ।
কেকোয়া কুষ্ঠা আছে পিষ্ঠের উপর ॥
সাধু বলে হই আমি লক্ষের সদাগর ।
এমন কন্যা বিবায় না দিব লক্ষ্মীন্দর ॥
দক্ষিণ রাজ্যের কন্যা নামে শিষ্যমতি ।
আছেরে সুন্দরী কন্যা নাই হয় বিবাহের যুগতি ॥

পাত্রী পছন্দ হলে অনেকে' কন্যা দেখা' অনুষ্ঠানে'গুয়াকাটা' বা নিরীক্ষন কাজটি শেষ করেন । এ ক্ষেত্রে পাত্রের যিনি কর্তা তাঁর সম্মতি ব্যতিত বিবাহ কার্য সমাধা হয় না । অনুরূপ ভাবে পাত্রীর যিনি অভিভাবক তাঁর সম্মতির উপরে ও বিবাহের পাকা কথা নির্ভর করে । এ ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর স্বাধীনতা বা পছন্দ অপছন্দের কোনো মূল্য অভিভাবকেরা সহসা দিতে চান না । কারন বিবাহে পাত্র -পাত্রীর স্বনির্বাচন রাজবংশী , মেচ ও রাভা সমাজ বিরোধী ।

প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানের মত বিবাহেও মেচ , রাভা ও রাজবংশী দের মধ্যে পঁইচ (পঞ্চায়েত) বা গ্রামসমাজকে আহ্বান করে পাত্র বা কন্যার বিবাহের অনুমতি নেওয়া হয় । এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর ন্যাস্ত হয় । বিবাহের সময় ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে গোটা গ্রামের পক্ষেই তা' নিন্দনীয় । সেই জন্যেই বিবাহের দায়িত্ব শুধুমাত্র কন্যার অভিভাবকই নন, গ্রামের প্রত্যেকেই গ্রহণ করে থাকেন । ' পঞ্চায়েত' যৌথ সমাজ ব্যবস্থার একটি উল্লেখ যোগ্য নিদর্শন ।

বিবাহে অংশ গ্রহনকারী রমনীদের বলা হয়'আহোই'। এঁরা বিবাহের বিভিন্ন স্ত্রী - আচার পালন করে থাকেন । কন্যা ও পাত্র পক্ষ বিবাহে সম্মত হলে প্রথমে বরপক্ষ কন্যা গৃহে উপস্থিত হন । বরের সঙ্গে বংশের সর্বশ্রেষ্ঠা বৃদ্ধা গমন করেন । একে বলা হয়'মহলানী'। বরপক্ষের আগমন বার্তা এক পক্ষকালের মধ্যেই কন্যাপক্ষকে

ছোঁত
হাত করানো হয়। তারপর বরপক্ষের একাধিক ব্যক্তি (দুই থেকে চার জন) কন্যাগৃহে উপস্থিত হন। সাধারণত: পাত্রপক্ষ থেকে পাঁচজনের বেশী যাওয়া সমাজ শোভন নয়। এবং এ সময় পাত্র পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের খাদ্যদ্রব্য যথা চেউড়ে দই, চিড়া, গুড়, চিনি, মিষ্ট দ্রব্য, মাছ, পান, সিঁদুর প্রভৃতি কন্যাগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। কন্যাকে আশীর্বাদান্তে এগুলি কন্যাপক্ষের মধ্যে বিতরিত হয়।

পশ্চিমবাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিবাহের পূর্বে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিধি নিষেধ প্রাচীন কালে তো বটেই, এখনও জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, গোয়ালপাড়া জেলার অনেক স্থানে পালন করা হয়ে থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ মৈথিলি, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র অথবা পঞ্চগ্রামী যে কোনো শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ অথবা 'পাঞ্জিয়ার' বা (গণক) পত্রপাত্রীর, রাশি, গণ, প্রভৃতি বিচার করেন। একে বলা হয় 'পাঞ্জিফুতি করা।' এই প্রথা শুধুমাত্র এতদঞ্চলেই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আজও প্রচলিত দেখা যায়। 'আসাম' অঞ্চলের সর্বত্র উচ্চশ্রেণীরহিন্দু সমাজে' রাজজোড়া' ব্যতীত' মিত্রষট্টাষ্টক', ' সমসপ্তক', 'নবপঞ্চম' 'মিত্রদ্বিদ্বাদশ'' তৃতীয় একাদশী',, 'দশচতুর্থক' ও' একাধিপত্য মিলন' প্রভৃতি ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের শুভাশুভ মিল দেখিয়া বিবাহ দেওয়া হয়।'[২] বিবাহ পূর্ববর্তী এই ক্রিয়ার নাম 'হাত চাওয়া' ক্রিয়া।

বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হলে দিন ও তারিখ ধার্য করা হয়। ফাল্গুন মাস বিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময়। কারণ এ সময় শীতের প্রকোপ কমে যায়, আবহাওয়া শুষ্ক অথবা নাতিশীতোষ্ণ থাকে;± প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান ঘরে তোলা হয়। অবশ্য আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও চৈত্র ব্যতীত অন্যান্য যে কোনো মাসে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ ছাড়া ভাদ্র মাসের প্রথম তের দিন বাদ দিয়েও অনেকে বিবাহ কার্য সমাধা করেন। এর পর 'দায়াত'বা নিমন্ত্রণের কাজ শুরু হয়।

নিমন্ত্রণের জন্য তিনটি উপকরণের প্রয়োজন হয়। যথা :-কাঁসা অথবা পিতল নির্মিত একটি ধাতুপাত্র, পা[illegible] সুপারী। একশ বছর আগেও এতদঞ্চলে রৌপ্যনির্মিত পাত্র ব্যবহৃত হত। কিন্তু অ[illegible]নের অবনতি ঘটায় রূপার বদলে কাঁসা বা

পান পাতা ও সুপারী মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যাবতীয় বিঘ্ন দূর হয়ে বিবাহ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়' পানগুয়া' দ্বারা নিমন্ত্রণের মধ্যে সেই কামনাই ব্যক্ত হয়।

বিবাহের পাকা কথা হওয়ার আগে' কইন্যাপণ' সম্বন্ধে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে আলোচনা হয়। মেচ উপজাতির লোকেরা কন্যাপণকে 'জান' বলে থাকেন। কন্যাকে তার পিতার কাছ থেকে ক্রয় করা হয় বলেই কইন্যাপণ' প্রথার প্রচলন ঘটেছে। রাভাদের মধ্যেও কন্যাপণ প্রথার প্রচলন আছে। এর পরিমাণ অন্যূন একশতটাকা। অবশ্য' পণ দিয়ে মেয়ে কেনা ঠিক ক্রীতদাসী কেনা বা অন্য পণ্যদ্রব্য কেনার মত নয়। কেননা ক্রীতদাসী বা ক্রীত অন্যান্য পণ্য দ্রব্য ক্রেতা আবার বেচতে পারে। কিন্তু যেখানে কন্যাপণ দিয়ে বিবাহ করা হয় সেখানে মেয়েকে আবার বেচা যায় না। বস্তুতঃ যা কেনা হয় সেটা হচ্ছে কন্যার সন্তান প্রসবিণী ক্ষমতা।[৩] কইন্যাপণ ছাড়া এই অঞ্চলে গ্যানগাই বা পাল উপাধিধারী কন্যার পিতা কন্যা সম্প্রদান করেন না। রাজবংশী সমাজে কন্যাপণের প্রচলন পঞ্চাশ বছর আগে ও অত্যন্ত ব্যাপকছিল। পণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা একশত থেকে একহাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। বর্তমানে বরপণ প্রথার প্রচলন শুরু হয়েছে। অনেক রাজবংশী বরকর্তা বা তিলক হিসাবেও শতাধিক টাকা দিয়ে থাকেন। পলিয়া, রাজবংশী, ঋন, মেচ, সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত পাত্রের অভিভাবকেরা বরপণ হিসেবে মোটা অঙ্কের টাকা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু কন্যাপণ প্রথা আজও একেবারে লুপ্ত হয়নি। কন্যাপণ দ্বারা ক্রীত কন্যা তাঁর শ্বশুরের কাছে 'কইনাবেটি' রূপে পরিগণিত হয়।

'ডালাখারা' বিবাহের একটি অঙ্গানুষ্ঠান। রাজবংশী বিবাহে ডালাখারা অনুষ্ঠানে পাত্রপক্ষের অভিভাবক কন্যাকে নিরীক্ষণ করেন। স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা ঐ জাতীয় কোনো ধাতুনির্মিত অলংকার অথবা অর্থ বা বস্ত্র দ্বারা ডালাখারা করা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। এই সময় কত গুলি লক্ষণ মেচ উপজাতিরা অশুভ বলে মনে করেন।

(১) জমি চাষ করা (লাঙ্গল দিয়ে)

(২) বাঁশ কাটা (বাঁশ ঝোপ থেকে)

(৩) শূণ্যকলস দর্শন (যাত্রাকালে গৃহে অথবা পথে)

(৪) মৃত জন্তু দর্শন (গৃহের সীমানায় অথবা পথে)।

বেজি বাঁ দিক দিয়ে রাস্তা পার হলে, শবযাত্রা দর্শন হলে, আকাশে মেঘের গর্জন শোনা গেলে তা রাজবংশী, রাভা, ভর ও খেন দের কাছে অশুভ লক্ষণ। এছাড়া ছেলের বাড়ির সামনে ভিজা কাপড় শুকোতে দেওয়া, বিবাহিতা অথবা কুমারী নারীর কেশ বিন্যাস, কোদাল দ্বারা মাটি কোপানো, কাঠ মাথায় করে রাস্তা পার হওয়া, কাঠের বোঝা

রাস্তার ধারে মামানো , ডানদিকে সাপ ও বাঁদিকে শিয়াল গমন প্রভৃতি অশুভ লক্ষণ। পক্ষান্তরে মাছবোঝাই ঝাঁকে ঝুড়ি , জলপূর্ণ কলসী , বাঁয়ে সাপ ও ডাইনে শিয়াল , প্রজ্বলিত চিতা প্রভৃতি শুভ লক্ষণ । মেচ উপজাতিরা কন্যাকে ধানের কাজে রত দেখলে তাকে অত্যন্ত সুলক্ষণা বলে মনে করেন ।

ডালাধারা অনুষ্ঠানে বেত বা বাঁশ দ্বারা নির্মিত একটি নাতিবৃহৎ ডালায় বিভিন্ন সামগ্রী সজ্জিত করে কন্যাকে উপঢৌকন দেওয়া হয় ।

বিবাহরাত্রির সাতদিন পূর্বে রাভা উপজাতি ও রাজবংশী সম্প্রদায় নিজ নিজ গৃহদেবতার পূজা করেথাকেন । এই সব দেবতার মধ্যে প্রধান হল বিষহরি ও কালী । এছাড়া গ্রামদেবতার পূজাও অনেকে করে থাকেন । গৃহদেবতা সন্তুষ্ট হলে বিবাহরূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয় না । এই সময় কেউ কেউ দেবতাকে অন্নব্যঞ্জন সহযোগে 'ভোগ' বা 'সেবা' দিয়ে থাকেন ।

পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিবাহের আর একটি অপরিহার্য অঙ্গানুষ্ঠান অধিবাস 'গন্ধ , মাল্য প্রভৃতি মাঙ্গলিক পদার্থ দ্বারা সংস্কার বিশেষকে 'অধিবাসন' বা অধিবাস বলা হয় ।'[৪]

কুচবিহার ও গোয়ালপাড়া জেলায় ঋন , রাজবংশী ও রাভাদের মধ্যে অধিবাসের পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই । অধিবাসের দিন অবস্থাপন্ন পাত্রের অভিভাবকেরা বাদ্যভান্ড সহযোগে এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটি পালন করে থাকেন । এর জন্যে প্রয়োজন হয় স্বর্ণ , রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু , প্রস্তরখন্ড , গন্ধ বা তেল , কাজল , ধূপ, দীপ, সিঁদুর , ফুল , ফল , দর্পণ , এবং দধি ।

পাত্রের সঙ্গে একাধিক বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন বিবাহ বাসরে অনুগমন করেন। এদের বলা হয় 'বৈরাতী' । বৈরাতী দের আদর আপ্যায়ণের পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে কন্যাপক্ষের অভিভাবকের উপর । তাঁদের নিয়োজিত কোনো অভিজ্ঞব্যক্তি বৈরাতীদের আপ্যায়ন করেন ।'ডারিঘর' বা বৈঠকখানা ঘর পরিষ্কার করে বরযাত্রীদের বসার ব্যবস্থা করা হয় । গরীব অথবা মধ্য বিত্তদের অনেকেই শুকনো খড় বা পোয়ালের উপর 'ধকড়া ' বা বস্তা বিছিয়ে তার উপর চাদর পেতে দেন । একে বলা হয় ' সেজা পাতা ' । কন্যার পিতা উপযুক্ত গৃহের অভাবে অনেক সময় নিজগৃহের সংলগ্ন গোশালায় বৈরাতী দের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন । বর্তমানে অবশ্য অবস্থাপন্ন নিকট প্রতিবেশীর কোনো গৃহ বৈরাতীদের জন্য নির্দিষ্ট হয় । কিন্তু প্রাচীন কালে এতদঞ্চলে কন্যার বিবাহে পিতার সুনির্ভরশীলতার প্রচন্ড মূল্য দেওয়া হত । সম্ভবত: সেই কারণেই একান্ত গরীব কন্যার পিতাও বৈরাতীদের জন্য প্রতিবেশীর গৃহের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের গোয়ালঘরে তাঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেন ।

বৈরাতী বা বরযাত্রীর নির্দিষ্ট সংখ্যা হলে কন্যাপক্ষকে জানানোর প্রথা নেই। বরের সঙ্গে যত খুশী বরযাত্রী আসতে পারে। কন্যাপক্ষের অভিভাবক যখন বিবাহের জন্য প্রস্তুত হন, তখনই তাঁকে ভাবী জামাতার গৃহের মান বা Status সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হয়। অবশ্য পল্ল ঘরের পাত্র হলে কন্যাপক্ষের অভিভাবক সেই ভাবেই প্রস্তুত হন।

"পাত্র বিবাহ আগমনে আসিবার পথে কন্যাপক্ষীয় যুবকেরা তোরণ দ্বারে পাত্র ও সঙ্গী পাত্রপক্ষকে আটক করে। উভয়পক্ষে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। ইহা হইল পৌরাণিক কালের ক্ষত্রীয় রীতি। এই হইয়ার পরে ও অলঙ্কারাদি বা যৌতুকপত্র নিয়া বলাড়া দ্বন্দ্ব হইয়া থাকে।" [৫]

বৈরাতী রা সমবেত ভাবে নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'মাড়োয়া' বা বিবাহ বাসরের কাছে উপস্থিত হতে দেওয়া হয় না। 'পঁইচ ভোজ' না হওয়া পর্যন্ত বরানুগমনকারীদের জলযোগের ব্যবস্থা করা হয় না। 'পঞ্চায়তি' শব্দটি উচ্চারন বিকৃতির ফল পঁইচ' এ রূপান্তরিত হয়েছে। বিবাহের শুরুতে বা পূর্ব মুহূর্তে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ গ্রামসমাজের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। আলোচ্য অঞ্চলে সামাজিক শাসনের কাছে বাস্তবে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য দেওয়া হয় না। 'পঞ্চজন' মিলিত হয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার কাছে ব্যক্তিকে সর্বদাই নতি স্বীকার করতে হয়। সেই জন্যেই বিবাহ সংস্কারের ক্ষেত্রে পাত্র ও পাত্রীর অভিভাবক নিজে নিজ গ্রামে পঞ্চায়তি বা গ্রাম সমাজকে আহ্বান করেন। প্রত্যেক গ্রামে একজন মাতব্বর বা মেড়ল থাকেন। দেউনিয়ার সঙ্গে গ্রামের আর ও পাঁচজন উপস্থিত হয়ে বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। বিবাহকে এতদঞ্চলের লোকেরা এমনই একটি দায়িত্বপূর্ণ সংস্কার বলে মনে করেন, যার সমাধানে শুধু মাত্র পাত্র অথবা কন্যার অভিভাবকের উপস্থিতিই যথেষ্ট বলে মনে করা হয় না,— গ্রাম-পঞ্চজনের উপস্থিতিতে নিমন্ত্রণ, রন্ধন, পরিবেশন, আপ্যায়ন, অভ্যর্থনা প্রভৃতি বিবাহানুষঙ্গিক কাজ সুষ্ঠু ভাবে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। সুনাম হলে শুধুমাত্র পাত্র-পাত্রীর পরিবার বর্গের নয়, গোটা গ্রামের সুনাম হয়ে থাকে; আবার কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে গ্রাম সমাজ তজ্জন্য দায়ী থাকেন।

পঞ্চজন বা বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের পঞ্চজন মিলিত ভাবে 'পঁইচ ভোজ' অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এ সময় বরযাত্রী গৃহের আঙিনায় অথবা 'ছেয়ামণ্ডপের' ধারে কাছে আসতে পারে না। 'পঁইচ ভোজের' পর কন্যার পিতা বা অভিভাবক অথবা তাঁদেরই কোনো প্রতিনিধি এসে অপেক্ষমান বরযাত্রী দের সামনে উপস্থিত হন। এ সময়

তাঁর হাতে থাকে একটি জলপূর্ণ পরিস্কার কাঁসা বা পিতলের গ্লাস। গ্লাসের উপরে একটি ও নীচে একটি খণ্ডিত কলাপাতা স্থাপন করা হয়। অতঃপর কন্যাপক্ষের অভিভাবক বা প্রতিনিধিগ্লাসটি বরযাত্রী দের সম্মুখে স্থাপন করেন এবং ভগ্নিস্তরে দুই হাঁটু ভাঁজ করে বরযাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন। অতঃপর বরপক্ষের লোকেরা কন্যা প্রতিনিধির সঙ্গে ভিতর বাটীতে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁদের বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। কোথাও কোথাও বিবাহের আগে বৈরাতী ভোজ শুরু হয়, কোথাও বা বিবাহের পরে বেলে বৈরাতীরা কন্যাপক্ষের অন্ন গ্রহন করে থাকেন। অন্নগ্রহনের সময় নির্ভর করে সম্পূর্ন বরযাত্রীদের ইচ্ছার উপর। কন্যাপক্ষ সেই মত ব্যবস্থা করেন।

ভিতরবাড়ীর আঙ্গিনায় 'মাড়োয়া' বা 'ছেয়া মণ্ডপ' তৈরী করা হয়। মণ্ডপের চারপাশে চারটি কলাগাছ ও ৪টি ঘট স্থাপন করা হয়। ঘটের উপর একটি আম্রপল্লব দেওয়া হয়। ঘটটি সাধারনতঃ মাটির হয়ে থাকে। ঘটের মাঝখানে চারটি সিঁদুরের লম্বা দাগ দেওয়া হয়। মাড়োয়ার উপরে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সামিয়ানা বা ত্রিপল টাঙ্গানো হয়।

মাড়োয়ার তলে বিবাহ শুরু হওয়ার পূর্বে বরকে কেন্দ্র করে একটি স্ত্রী - আচার পালিত হয়। এর নাম 'বর চুমা'। নানাবিধ স্ত্রী- আচারের মধ্যে এটি অন্যতম। কন্যার যিনি জননী, তাঁর হাতে একটি চালন বাতি থাকে। বাম-হস্তে হস্তধৃত চালন বাতি থেকে একে একে জলে গোলা সিঁদুর ও কাজল নিয়ে কন্যারমাতা ভাবী জামাতার কপালে লেপন করেন। এই স্ত্রী - আচার পালিত না হলে অধিকারী বা ব্রাহ্মন কাশ্যপ ও হরিতকি দ্বারা কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারেন না। বর কন্যাগৃহের উপস্থিত হলে কন্যার পিসিমা অনুরূপ ভাবে বরচুমা অনুষ্ঠান টি পালন করে থাকেন। এ সময় বাঁশ বা বেতের তৈরী একটি ডালা বা চালনিতে একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ ও তার সঙ্গে পান, সুপারী, ধান, দূর্বা, ক্ষীর বা অন্য যে কোনো মিষ্টদ্রব্য থাকে। দণ্ডায়মান বরকে প্রদীপ বা প্রজ্বলিত আলোকশিখা দেখানো হয়। তারপর দুটি পান দুই গালে স্পর্শ করানো হয়। সর্বশেষে ধান ও দূর্বা মাথায় ছিটিয়ে বরকে আশীর্ব্বাদ করে বসতে দেওয়া হয়। এই সময় বরের সঙ্গে 'পানিগামছা' নামক একটি গামছা থাকে।

বরচুমাকে অনেকে 'চালানবাতি করা' বলে থাকেন। 'চালান' (চালানি), (চালন) ও বাতি শব্দদুটি একত্রে যুক্ত হয়ে চালানবাতি হয়েছে।

এতদ্‌চঞ্চলে ব্রাহ্মণ হস্তক্ষেপের পূর্বে বিবাহের সময় সীমা ছিল অত্যন্ত কম। সে সময় বিবাহের কোনো নির্দিষ্ট লগ্ন বা ক্ষণ নির্ধারিত হত না। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় কোনো কোনো গ্রামে সন্ধ্যা থেকে শেষ রাত্রির মধ্যে যে কোনে সময় কন্যা সম্প্রদান করা হত। ব্রাহ্মণ হস্তক্ষেপের ফলে পশ্চিম বাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রাচীন বিবাহ প্রথার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে।

'মাড়োয়া' বা 'ছেয়ামণ্ডপে' পাত্র ও পাত্রী পূর্ব দিকে মুখ করে বসার পর অধিকারী বা ব্রাহ্মণ বিবাহের মন্ত্র উচ্চারন করেন। এ মন্ত্র দর্শকের কর্নগোচর হয় না। অর্ধশতাব্দী আগেও রাজবংশী পাত্রীর পায়ে বিবাহের আগে হরবারি গাছের রঙ বা 'মেহেন্দি' (মেহদি) মাখানো হত। এখন দোকানের আলতা ব্যবহৃত হয়। রাজবংশী ও রাভাদের কাছে যেমন তুলসী বৃক্ষ, তেমনি মেচাদের কাছে সিজু গাছ অতি পবিত্র। সিজুগাছের সামনেই বিয়ের আলাপ হয়, সিজুগাছের খুব কাছেই বিয়ের জন্য স্থান নির্বাচিত হয়, বিয়ের সময় বর ও বধূকে সিজুগাছের চারদিকে চলমান ঘড়ির কাঁটার বিপরীত প্রক্রিয়ায় সাত বার ঘোরানো হয়। এ সময় পাত্র ও কন্যাপক্ষ অভিভাবক ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে 'কারোয়া' বা 'বাড়িখাটা ও' (ঘটক) উপস্থিত থাকেন। সিজুগাছকে কেন্দ্র করে আবর্তনের সময় এয়োস্ত্রীরা বরবধূর মাথায় আতাপচাল ছিটিয়ে দেয়। বধূ ডান হাতে কিছু চাল নিয়ে বরের মাথায় ছিটিয়ে দেয়। বর অনুরূপ ভাবে কিছু চাল নিয়ে বধূর মাথায় ছিটিয়ে দেয়।

সদ্যবিবাহিত রাভা দম্পতি অধিকারী বা ব্রাহ্মণের নির্দেশে 'অং -সিন্দুর দেখ্‌না' ও 'আয়না দেখ্‌না' আচার দুটি পালন করেন। বর ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল কিছু সিদুঁর নিয়ে স্ত্রীর কপালে ও সিঁথিতে ফোঁটা দেয়। বধূ কাজল নিয়ে তিনবার স্বামীর কপালে ফোঁটা দেয়। এরপরে বধূ একটি আয়না নিয়ে তিনবার বরের মুখের সামনে তুলে ধরেন। বর ও অনুরূপ ভাবে বধূকে তিনবার আয়না দেখান।

রাভা উপজাতির বিবাহে অধুনা যজ্ঞের আয়োজন হিন্দু ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিবাহগীতি আহোই বা এয়োস্ত্রীদের একটি পবিত্র কর্তব্য। বিবাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজবংশী, কোচ, খেন, মেচ, প্রভৃতিদের মধ্যে বিবাহ গীতির প্রচলন রয়েছে। বিবাহ গীতি বা বিবাহের ছড়া ব্যাতীত বিবাহকার্য অসম্পূর্ন থেকে যায়। যাঁরা বিবাহের ছড়ায় পারদর্শী

তাঁরাই এই সমস্ত ছড়াগুলি সুর সহযোগে গেয়ে থাকেন। বিবাহগীতিতে কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। বিবাহগীতির জন্য কখনও কখনও অন্যান্য গ্রাম থেকে দুই বা ততোধিক গায়িকাকে নিয়ে আসা হয়। বিবাহগীতি শুধু মাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয়, রাজপুত, পাঞ্জাবী ও মুসলমান জাতির মধ্যেও প্রচলিত দেখা যায়। মালদহের চাঁই জাতির মধ্যেও বিবাহগীতির প্রচলন রয়েছে।

এতদঞ্চলে বিবাহগীতির সুর সর্বদাই নারী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। অধিবাস থেকে শুরু করে বিবাহের সমাপ্তি পর্যন্ত গান চলতে থাকে। অধিকাংশ গানেই বরপক্ষকে আক্রমণ করা হয়।

গোয়ালপাড়া জেলায় বিবাহের গীতকে বলা হয় 'বিয়ার গীত'। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলে বলা হয় 'বিথোর গীত'। বিবাহগীতির জন্য কয়েকজন গায়িকাকে বিবাহবাটীতে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন না থাকলে এই আমন্ত্রণ কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না।

বর ও বরযাত্রীদের উদ্দেশ্য যে গান গাওয়া হয় প্রকৃতপক্ষে তা' বিদ্রুপাত্মক গানের সমষ্টিমাত্র। বিবাহগীতিকে যেগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল হাস্যরসাত্মক, গোয়ালপাড়া জেলায় সেগুলিকে বলা হয় 'হেরা যোড়া নাম।' কামরূপ অঞ্চলে এই গীতকে বলা হয় 'খেচা গীত'। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় এর নাম 'খিচর গীত'। 'খিচর' শব্দের অর্থ হাসি - ঠাট্টা, রঙ্গ - তামাসা বা বিদ্রুপ। বিবাহের সময় যে গানে বিদ্রুপের মধ্যে দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয় তার নাম যোড়া নাম, খেচা-গীত বা খিচর গীত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য, গুজরাটে বরের উদ্দেশ্যে যে বিবাহগীতি প্রচলিত আছে, তা' বিদ্রুপাত্মক নয়। "বর বিয়ে করতে এলে মহিলারা বরের প্রশস্তায় গান করে।"[৭]

মেচ উপজাতির মধ্যে বিবাহে ময়ূর নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। আবার বোড়ো-দের মধ্যে আছে 'বারলাক্ষা' নামক নৃত্য। বরপক্ষীয় দুজন নর্তক 'বারলাক্ষা' নৃত্যে অংশ গ্রহন করেন।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই আলোচ্য অঞ্চলে বিবাহে বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। সাধারনতঃ চর্ম নির্মিত বাদ্য যন্ত্র-যেমন ঢাক, মৃদঙ্গ বা খোল, নাকাড়া বা কুদু মুদু প্রভৃতির সাথে কাঁসি ও সানাই বাজতে থাকে। বৃদ্ধদের মতে শঙ্খ, শিঙ্গা ও করতালের ব্যবহারও প্রাচীন কালে এতদঞ্চলে ছিল। ঢাক ও সানাই

দরিদ্র গৃহস্থও বিয়ের সময় ব্যবহার করতেন। কখনও চার মাত্রার দ্রুত কাহারবা তালে,আবার কখনও বা ছয় মাত্রার দ্রুত দাদরার তালে করুণ মধুর সুরে সানাই ও কাঁসি বিভিন্ন চর্ম নির্মিত বাদ্যযন্ত্রের সাথে বাজতে থাকে। বাজনার দ্বারা করুন রস সৃষ্টি করার মধ্যেই বাদ্যকারের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

কড়ি দ্বারা বিনিময় প্রথার যুগে পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে পূর্বাঞ্চলে জগঝম্প বা ভোটতাল নামক বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল বলে এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা মনে করে থাকেন। ভোটতালের আকৃতি বৃহদাকার করতালের মত। আজকাল শ্রাদ্ধের সময়, এই যন্ত্রটিকে মৃদু মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজতে শোনা যায়। বিবাহে মন্দিলা (মন্দিরা) এবং অধুনা লুপ্ত দোগর নামক বাদ্যযন্ত্রের ও প্রচলন এ অঞ্চলে প্রাচীন কালে ছিল। জলপাইগুড়ি জেলার মাবিয়ালী গ্রাম থেকে প্রাপ্ত পূর্বোক্ত মনসামঙ্গলের পুঁথিতে লক্ষীন্দরের বিবাহে ব্যবহৃত একাধিক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি আজও আলোচ্য অঞ্চলের অন্যান্য সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। বাদ্যযন্ত্রগুলি হল –

খোল মিদ্যং বেনা বাঁশি দোগর মন্দিলা কাঁসি
শঙ্খ শিঙ্গাঁ বাজে করতালী।
চান্দোর ঘরের বধূগন বেশ করে জনে জন
নানান বরনে পরে শাড়ী ॥

কড়ির যুগে 'সজিকচু' গাছের বিনিময়ে এতদঞ্চলের কোথাও কোথাও কন্যাসম্প্রদান অনুষ্ঠানটি পালিত হত।[৮]

অধিবাসের দিন বাঁশ বা বেতের তৈরী চালনি সাজানো হয়। এতে একছড়ি কাঁচা অথবা অর্ধপক্ক মধুয়া কলা, দুর্বা, একখন্ড পাথর, সিদুঁর, কড়ি ও কিছু পরিমাণ কাঁকোয়া ধান রাখা হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, পার্বতীর সঙ্গে মহাদেব যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তখন সেই বিবাহে 'কাঁকোয়া ধান' ব্যবহৃত হয়েছিল। তাই শৈবপন্থী রাজবংশীরা আজও সে অধিবাসের চালনিতে সে কাঁকোয়া ধান রাখেন। কাঁকোয়া ধান আকারে বেশ বড়। এতে এক বড় শুয়াঁ বা কাটা দেখা যায়। মধুয়া কলা যাতে সাতদিন চালনিতে রাখতে হয়। তাই কাঁচা বা অর্ধপক্ক না হলে গোলি ছড়ি থেকে খসে যেতে পারে। এই কারনেই পাকা কলার পরিবর্তে কাঁচা মধুয়া কলা অধিবাসের চালনিতে রাখা হয়। বিবাহের সাত দিনের মধ্যে ছড়ি থেকে কলা খসে পড়া অমঙ্গলের চিহ্ন।

বিবাহের আর একটি অনুষ্ঠান 'ডালাখারা'। ডালাখারার আর এক নাম 'দরগুয়া'। কন্যাপণ প্রথা যে সময় প্রচলিত ছিল, সেই সময় এতদঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিবাহের পূর্বে এক ডালা গুয়া বা সুপারী সঙ্গে নিয়ে পণবাবদ টাকার দরাদরি হত। 'দর' অর্থ মূল্য। এর সাথে গুয়া (সুপারী) শব্দটি যুক্ত হয়ে দরগুয়া পদটির সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে ডালাখারার সময় যে ডালাটি ব্যবহৃত হত সেটি চৌকো আকৃতির-বিশিষ্ট হত। ডালাটির উপরে কোনো ঢাক্না থাকত না। ভিতরে চার বা ততোধিক ঘর বা খোপ থাকত। এর মধ্যে পান, চুন ও সুপারী সাজিয়ে বরপক্ষের সামনে উপস্থিত করা হত।

প্রাচীন কালের মত আজ ও এতদঞ্চলে বাল্যবিবাহ প্রথার প্রচলন রয়েছে। অবশ্য প্রথাটির ব্যাপক প্রচলন আজ আর নেই। সম্ভবতঃ বাল্যবিবাহ প্রথার কুফল সম্বন্ধে আলোচ্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সচেতন হওয়ার পর থেকেই প্রথাটির ক্রমাবলুপ্তি ঘটতে শুরু করেছে। অবস্থাপন্ন জোতদার বা ধনী কৃষকের বালিকা কন্যার সঙ্গে 'দানীবুড়ি' নামে একজন বয়স্কা মহিলা কন্যার স্বামীগৃহে গমন করতেন। অনভিজ্ঞা নববধূর যাবতীয় কাজ দানীবুড়িই করে দিতেন। কন্যার সঙ্গে কিছুদিনের জন্য দান করা হত বলেই একে 'দানিবুড়ি' বলা হত।

বিবাহে দক্ষিণা ও ভিক্ষা দানের যে প্রথা প্রচলিত ছিল আজ ও তা লুপ্ত হয় নি। অধিকারী বা ব্রাহ্মণ দ্বারা বিবাহের পূর্বে দক্ষিণা দেবার রীতি ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ হস্তক্ষেপের পর বিবাহদান কার্যে দক্ষিণা গ্রহণ প্রথার প্রচলন ঘটে। বিবাহের পর ভিক্ষাপাত্র হাতে নাপিতও ভিক্ষা গ্রহন করত। হিন্দুর বিবাহে কাজী ও ফকিরদের ভিক্ষা দেবার প্রথা ছিল।

বিবাহের পর মেজর ঘর বা ঘরে বাসরঘরে বরকে পূর্বদিকে মুখ করে বসানো হয়। এই সময় বরকে ভোজন করানো হয়। পঁচিশ বছর আগে মেচ এবং বোড়োদের বিবাহোৎসবে পর্যাপ্ত পরিমানে মদ ও মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল। বর্ষিয়ান বোড়োদের অনেকেই সাতদিন ধরে এই ধরনের আনন্দোৎসবে মত্ত থাকতেন। উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী মেচ উপজাতি সেই তুলনায় অনেক সংযত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ ভারতের মানডলা ও বালাঘাটের বাইগা উপজাতির মধ্যে ও বিবাহের পূর্বে এবং পরে মদ্যপান প্রথা প্রচলিত আছে।" বিবাহ স্থির হয়ে গেলে বরের বাবা দু' বোতল মদ এনে কন্যে বাবাকে উপহার দেয়। এই মদের কিছু পরিমাণ বুড়া দেওতার কাছে উৎসর্গ করা হয়। আর বাকিটা সমবেত সকলের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'আগাই' বলা হয়।"[৯]

বিবাহান্তে নববধূর উপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এর নাম 'ছানফেলা'। উক্ত কাজের মধ্য দিয়ে বিবাহিতা স্ত্রী তাঁর নতুন সংসারের যাবতীয় কার্যভার গ্রহণ করেন। 'ছান' শব্দের অর্থ গোবর। বাসরঘর থেকে বের হয়ে নববিবাহিতা বধূ কিছুটা গোবর নিজের হাতে তুলে নেয়। গোবর আগেই সংগ্রহ করে রাখা হয়। ঐ গোবর বধূ স্বহস্তে ঘরের 'ছানের খুনি' বা গোবরের ঢিবিতে ফেলে দেয়। এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বধূ তাঁর নতুন কর্ম জগতে প্রবেশ করে। এই প্রথাটি শুধুমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

রাভাদের মধ্যে বাসরঘরে কড়ি খেলার প্রচলন রয়েছে। এর পেছনে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। বরের বাঁ দিকে বধূ বসে। সঙ্গে উভয়পক্ষের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বসেন। প্রথমে বর কয়েকটি কড়ি হাতে নিয়ে সেগুলিকে 'সেজা' বা বিছানার উপর আস্তে ছুঁড়ে দেয়। কড়ি গুলির অধিকাংশই যদি চিৎ হয়ে পড়ে, বিবাহ তাহলে সুখের হয় না। বরের তিনবার কড়ি চালার পর একইভাবে অনুরূপ ভাবে বধূও বাসর ঘরে তিনবার কড়ি চালেন। সাঁওতালীর মেচবধূদের মধ্যে স্বামীগৃহে প্রবেশের সময় দুয়ারে রাখা দুটি কলসীর একটিকে বাঁ পা দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে দেওয়া বা ভেঙ্গে ফেলার প্রথা প্রচলিত আছে।[১০] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মধ্য প্রদেশের ওঁরাও, কোরবা প্রভৃতি জাতিসমূহের মধ্যেও নববধূ পাঁচবার মন্ডপ প্রদক্ষিণের সময় কুলোয় রাখা খই ছিটিয়ে দেয় এবং প্রতিবার প্রদক্ষিণ করার সময় কনে পা দিয়ে যাঁতার উপর স্থাপিত চালের স্তূপ গুলি মাটিতে ছড়িয়ে দেয়।[১১]

আলোচ্য অঞ্চলে 'গিরি' বা জোতদার এবং প্রজার মধ্যে সঙ্গে একবিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। মুখ্যতঃ গ্রামকেন্দ্রিক এবং কৃষিভিত্তিক জীবন বলেই এতদঞ্চলে প্রজার বিবাহে গিরির প্রতি তাঁর অবশ্য পালনীয় কতগুলি কর্তব্য থেকে যায়। 'গিরি' শব্দের আঞ্চলিক অর্থ জোতদার বা জমির মালিক। গিরির জমি প্রজা চাষ করে এবং উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত ভাগ পায়। গিরির মঙ্গলের সঙ্গে তাই প্রজার মঙ্গল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনুরূপ ভাবে প্রজার সুখসুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া গিরির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বস্তুতঃ গিরি-প্রজার পিতা-পুত্রের মত মধুর সম্পর্কের মধ্যেই পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের গ্রাম-জীবনের শান্তি নিহিত। প্রজার কাছে গিরি তাই শুধুমাত্র অন্নদাতাই নন, পিতাও বটেন। সেই কারণেই প্রত্যেক প্রজা বিবাহের সময় গিরিকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করে থাকেন। গিরি বা জোতদার সন্তানতুল্য প্রজাকে বিবাহে সাহায্য করে থাকেন। এই সময় প্রজা তাঁর পণের টাকা থেকে সামান্য অংশ পিতৃতুল্য গিরিকে দান করে থাকেন। একে বলা হয় 'ধিনো'। প্রতি কুড়ি টাকায় একটাকা ধিনো দেওয়া হয়। বরপক্ষের

অভিভাবক বা প্রতিনিধি স্বয়ং গিরির বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে ধিনো প্রদান করে থাকেন।

বিবাহের এক বছরের মধ্যে কন্যার 'ভাদর কাটানি' হয়। ভাদর কাটানির মূলকথা হল স্বামীগৃহ থেকে বধূর পিত্রালয়ে গমন। 'কাটানি' অর্থ 'অতিবাহিত করা। যে বছর কন্যার বিবাহ হয়, ভাদর কাটানি সেই বছর পালন করা হয়। বিবাহের পরবর্তী পাঁচমাস অতিক্রান্ত হলে তবেই বিবাহিতা কন্যা বাপেরবাড়ী যেতে পারে। কন্যাকে নেবার জন্য বাপের বাড়ী থেকে পিতা অথবা ভ্রাতা উপস্থিত হন। বাপের বাড়ীতে একমাস থেকে দুমাস থাকার নিয়ম। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। এ সময় কন্যার পিতা বা ভ্রাতাকে 'কারাল' বা প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। বিবাহিতা স্ত্রী যেহেতু 'পরঘরী' বা পরের ঘরের, সেই হেতু তাঁকে যথাসময়ে তাঁর স্বামী গৃহে প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কন্যার নিকট আত্মীয়েরা তাঁকে পিতৃগৃহে নিয়ে যেতে পারেন। নির্দিষ্টসময় উত্তীর্ণ হলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার জন্য স্বামী স্বয়ং উপস্থিত হন। অনেক সময় স্বামীর সঙ্গে তাঁর পুরুবন্ধু বা আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হন। এক্ষেত্রে মেয়েকে আরও কিছু দিন বাপের বাড়ীতে রেখে দেবার ব্যাপারে কন্যার পিতামাতার জোর খাটে না। কারণ মেয়ে তখন 'নওদারী' বা বিবাহিতা। নববিবাহিত জামাই শ্বশুর বাড়ীতে চব্বিশ ঘন্টার বেশী সাধারণত: থাকেন না। এক দিনের বেশী থাকা সমাজ শোভন নয়। লোকনিন্দা ভীতির ফলেই একদিন পরে জামাই স্বগৃহে গমন করেন। অবশ্য কন্যাপক্ষ থেকে প্রচন্ড পীড়াপীড়ির ফলে জামাই অনেক সময় দুদিন শ্বশুর বাড়ীতে অতিবাহিত করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভাদর কাটানির অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে পালিত হত। এর নাম 'সাঙ্গীভার'। নববিবাহিতা কন্যাকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম পিতৃ-গৃহে আনা হত। অনুষ্ঠানের উপকরনের মধ্যে প্রধান ছিল মালভোগ বা চাঁপাকলার ছড়ি, চিড়া, মুড়ি, মুড়কি ও দই। এগুলিকে সিঁদুর ও খড়িমাটি রঞ্জিত কতগুলি মৃৎপাত্রে সাজিয়ে কন্যার শ্বশুরালয় থেকে পিত্রালয়ে আনা হত।

বিবাহের কয়েকদিন পরেই বাপের বাড়ীর বিভিন্ন খবর মেয়ের কাছে পাঠানো হয়। একে বলা হয় 'খদানী'। কন্যার কোনো নিকট আত্মীয় এই খবর বহন করে নিয়ে যান। আত্মীয়ের সঙ্গে থাকে দই ও, চিড়া, কলা, গুড় ইত্যাদি।

পিতৃগৃহে অবস্থান কালে কন্যা এবং তাঁর আত্মীয় বর্গকে কর্মসংক্রান্ত একটি বিধি অবশ্যই পালন করতে হয়। এ বিধিটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে। পিতৃগৃহে অবস্থান কালে কন্যা ঝালক নামক একটি অপূর্ব সুন্দর চটের শয্যা আচ্ছাদনী নির্মান করেন। কোথাও কোথাও এর নাম ঝালোক বা ঝালুক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কন্যার মা, বোন, দিদি অথবা অন্য কন্যাকে ঝালোক নির্মানে

সাহায্য করেন। স্বামী গৃহে গমন কালে কন্যা এটি সঙ্গে নিয়ে যান। যদি স্বামী-গৃহে ভাসুর, শ্বশুর অথবা অন্যান্য গুরুজন থাকেন, তবে প্রত্যেকের জন্য একখানি করে ঝাঁলোক তৈরী করতে হয়। ঝাঁলোক দৈর্ঘ্যে সাধারনতঃ পাঁচ হাত এবং প্রস্থে দেড় হাত থেকে দু'হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই রকম তিনটি অংশ বা টুকরো জোড়া দিয়ে একটি পূর্ণ ঝাঁলোক তৈরী হয়। এতে লাল, সবুজ, কালো, হলুদ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের পাটের সূতা ব্যবহার করা হয়। সমাজের বিবর্তন ও ব্যক্তির প্রাত্যহিক কর্মের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঝাঁলোক তৈরী করার বিধি বা প্রথা প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে বলা যায়। কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর আগে ও দোকান থেকে (যদি গৃহে তৈরী করা সম্ভব না হয়) ঝাঁলোক কিনে দেওয়া হত। বর্তমান যুগে ঝাঁলোক উপহার দেবার প্রথা কদাচিৎ চোখে পড়ে। মনে হয় একবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই বিবাহের পর পিতৃগৃহে কন্যার ঝাঁলোক নির্মাণ ও উপহার দেওয়ার প্রথাটি অবলুপ্ত হবে।

রাজবংশী, রাভা এবং মেচদের মধ্যে 'উঠানী' বিবাহের প্রচলন আজও রয়েছে। বিবাহের কথা পাকা হলে কন্যাকে তাঁর পিতা বা অভিভাবকের বাসগৃহ থেকে উঠিয়ে আনা হয়। উঠানী বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র বরযাত্রী সহ কন্যাগৃহে গমন করেন না। পাত্রের বাসভবনেই আনুষ্ঠানিক ভাবে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। উঠানী বিবাহে 'মিস্তর ধরা' নামক অনুষ্ঠানটি ও পালন করা হয়ে থাকে। বরের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বিয়েতে 'মিস্তর' ধরেন। কোনো আত্মীয় বিবাহে মিস্তর ধরতে পারেন না। মিস্তর ধরার অর্থ বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করা ও বিবাহে সাক্ষী থাকা। 'মিস্তর' বা বন্ধুকে বিয়ের সর্বক্ষণ পাত্রের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে হয়।

বোড়ো বা মেচ উপজাতীয় রমনীরা অনেক সময় ছেলে পছন্দ করে তার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে। এর নাম 'খারছান্নায়।' এই সব ক্ষেত্রে ছেলেপক্ষ কন্যাপক্ষকে খবর দেবে। কন্যার অভিভাবক এসে কন্যাকে স্বগৃহে তখন ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। নতুবা পাত্রপক্ষ বা ছেলের অভিভাবককে সমাজের কাছে দায়ী হতে হয়। এর পরেও যদি মেয়ে ছেলের ঘরে এসে ওঠে, তবে সে ক্ষেত্রে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়।

রাভাদের মধ্যে 'ঘরযাই' নামক এক ধরনের বিবাহ আজও প্রচলিত আছে। এ ক্ষেত্রে ছেলে কিছুদিন মেয়ের বাপের বাড়ীতে বাস করে এবং নানা ধরনের সেবামূলক কাজের দ্বারা কন্যার অভিভাবককে সন্তুষ্ট করে কন্যাকে গ্রহণ করেন। বিয়ের পর ছেলে শ্বশুর বাড়ীতে থাকেন অথবা নতুন বাসগৃহ নির্মান করেন। পিতার গৃহে

পুত্র পুনরায় নতুন সংসার পাতেন না ।

রাভা, মেচ, রাজবংশী, গিরি এবং ভরদের মধ্যে একাধিক বার বিবাহ পুরোপুরি নিষিদ্ধ না হলেও একের অধিক বিবাহকে তাঁরা পছন্দ করেন না । গিরি এবং ভরদের বিবাহ পদ্ধতি রাভা, মেচ এবং রাজবংশী বিবাহ পদ্ধতিরই মিশ্র রূপ । সমাজে 'পানিছিটা বিয়ে' বা 'পানি সর্পন' বিবাহ প্রচলিত আছে । দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যেই এই ধরনের বিবাহ কদাচিৎ দেখা যায় । দেবতাকে সাক্ষী করে নির্বাচিত ব্যক্তির পায়ে কন্যা জল ঢেলে দেয় । এই ধরনের বিয়েতে কোনো মন্ত্র উচ্চারিত হয় না । এ বিবাহ আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন হয় না । তাই নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশীর উপস্থিতি সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ।

বিশ্বের বিভিন্ন জাতির বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি মানবজাতির বিবাহ প্রথাকে মাতৃবংশীয় ও পিতৃবংশীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় । পিতৃবংশীয় প্রথার ধারক আর্য ও দ্রাবিড়, এবং মাতৃবংশীয় প্রথার ধারক অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী । পশ্চিম বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজবংশী, মেচ, রাভা, গিরি, ভর প্রভৃতি সম্প্রদায় ও উপজাতি দীর্ঘ দিন ধরে আর্যসংস্কৃতি পুষ্ট হয়েছে বলে তাঁদের মধ্যে পিতৃ ও মাতৃ বংশীয় প্রথা অদ্যাবধি যুগ্মভাবেই প্রচলিত । আবার অধুনা হিন্দু বিবাহের মত উপজাতি - বিবাহের ক্ষেত্রে ও গনতান্ত্রিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । ফলে যে বিবাহিতা নারী সাধারণতঃ শ্বশুরালয়ে কারনে অকারনে - অকারনে আত্মীয় পরিজনের কাছে নিগৃহীতা হতেন, পাশবিক অত্যাচার আজ তাঁর কাছে মাথা নত করেছে । লাজনম্রা বধূ শত অত্যাচার সহ্য করে আজ আর নীরবে অশ্রু মোচন করেন না ।" আজ সে শিক্ষা পেয়েছে, স্বাধীনতা পেয়েছে, আজ সে পুরুষের সঙ্গে সমান পদক্ষেপ ফেলে জীবন যাত্রার পথে অগ্রসর হবার সাহস ও সুযোগ পেয়েছে । একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রভাবেই এই সামাজিক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটেছে ।" [১২]

– গর্ভ ও প্রসবকালীন স্ত্রী আচার –

পশ্চিম বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজবংশী, মেচ, ডর, রাভা, গিরি প্রভৃতি উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে গর্ভ ও প্রসবকালীন স্ত্রী আচারের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। গর্ভাবস্থায় নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে সন্ধ্যার সময় একে বাঁশ-ঝাড় বা মেঠো পথ দিয়ে গর্ভিনী নারী একাকিনী যাওয়া আসা করতে পারে না। মাশান নামক অপদেবতা সবসময় গর্ভনাশ করার জন্য ওৎ পেতে থাকে। এবং সুযোগ পেলেই তারা গর্ভিনী নারীকে আক্রমণ করে। এই ধরনের বিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে যে "অসুর গর্ভিনীকে নিদ্রায় জাগরনে আক্রমণ করে গর্ভ নাশ করার জন্য। ..... গর্ভ বিনাশক অসুর নাকি কখন ও কখন ও স্ত্রী স্বরূপ ধারণ করে।" [১৩]

সর্বত্রই প্রসবের সময় 'ধাই' বা দাই কে ডাকা হয়। দাইকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করা হয়। প্রসবের কিছুদিন আগেই বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে 'ছাপড়া' নামক একটি অস্থায়ী ঘর তৈরী করা হয়। একে অনেকে 'পাশটি ঘর' ও বলে থাকেন। 'চুলাঘরা' বা 'রান্নার নোগো উ'- এর স্পর্শ বাঁচিয়ে 'পাশটি ঘর' বা আতুর ঘর তৈরী করা হয়।

রমনীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হলে দাই এসে উপস্থিত হয়। সন্তান প্রসবের পর অশৌচ শুরু হয়। এর আগে রাজবংশী, রাভা, ডর, মেচ রমনীকে অশৌচ বলে ধরা হয় না। সন্তান প্রসবের পর এক সপ্তাহ কাল-ব্যাপী পরিবারের সকলেই অশৌচ পালন করেন। অনেকে আবার পাঁচ অথবা আট দিনও অশৌচ পালন করেন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার একঘন্টার মধ্যেই নাড়ী কাটা হয়। এই সময় 'ছুটকুনি' নামক একটি ধারালো বাঁশের অস্ত্র দাই ব্যবহার করেন। 'ছুটু' শব্দের অর্থ কাটা, ছাড়িয়ে দেওয়া, দূরকরা বা বিচ্ছিন্ন করা। যে অস্ত্রের সাহায্যে নাড়ী কাটা হয় তার নাম ছুটকিনি। অনেকে ছুটকানি বা সুচকুনি ও বলে থাকেন।

পাঁচ, সাত অথবা আটদিন পরে কামানি হয়। এই সময় নাপিত, রোগে পরিবারের কর্তা, মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন উপস্থিত থাকেন। নাপিত শিশুর মাথায় চুল ক্ষুর দিয়ে কামিয়ে দেয়। এর পরিবর্তে দক্ষিণা স্বরূপ তাকে অর্থ চাল, বা কাপড় প্রদান করা হয়।

নবজাত শিশুর মুখদর্শনের জন্য বিত্তশালী পিতা সাধারনত: রৌপ্য নির্মিত অলংকার ক্রয় করেন। শিশুর মুখ নিরিক্ষণের সময় সেটি শিশুকে প্রদান করা হয়। এই প্রথাটি ক্রমশ: অবলুপ্ত হচ্ছে। অর্থ নৈতিক দুরবস্থাই এর অন্যতম প্রধান কারন।

শিশুর নামকরনের জন্য কোনো বিশেষ দিনক্ষন নির্ধারিত হয় না। শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জন্মবার অথবা মাস অনুসারে তার নাম রাখা হয়। এই প্রথাটি বিশেষ ভাবে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। সোমবারে যে শিশুর জন্ম হয় তাকে 'সোমারু' নামে ডাকা হয়। তেমনি মঙ্গলবারে জন্ম হলে মংলু। বুধবারে বুধারু, শুক্রবারে শুকরু, শনীবারে শানিয়া, বৈশাখ মাসে জন্ম গ্রহণ করলে অনেকে নাম রাখেন বৈশাগু। তেমনি আষাঢ় মাসে আষাঢু, ভাদ্র মাসে ভাদ্রু। মাঘ মাসে মাঘু, চৈত্র মাসে চৈতু। অমাবস্যা তিথির অন্ধকার রাত্রিতে জন্ম হলে তার নাম রাখা হয় আন্ধারু। ঝড় বাদলের দিনে জন্ম গ্রহণ করলে তার নাম রাখা হয় ঝড়ু। জন্মের পর শিশু বেশী কাঁদলে তাকে কান্দুরা নামে ডাকা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন দেবদেবীর নামে ও শিশুর নামকরন হয়। অতি আধুনিক নাম এক সময় মেচ, রাজবংশী, রাভা, ভর গিরি প্রভৃতিদের মধ্যে অপ্রচলিত ছিল। বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রনের ফলে এতদঞ্চলে নামের ক্ষেত্রে ও বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। দুশো বা তিনশ বছর আগে ছেলে মেয়েদের যে নাম রাখা হত তাতে দেবনামের প্রধান্যই ছিল বেশী। নগেন্দ্র, কিঙকরদেব, প্রাণকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ, পতিত পাবন, যোগেন্দ্র, কিশোরীমোহন, গিরিশ, গোপাল, প্রভুদয়াল ইত্যাদি। কালক্রমে নামকরনে আধুনিকতার স্পর্শ এল। ডাকনামের সঙ্গে এমন একটি ভাল নাম বা আসল নম যুক্ত হল যা ইতিপূর্বে কখন ও শোনা যায় নি। যে মন নির্মাল্য। কমল, ধ্রুবজ্যোতি, দেবজ্যোতি, অরুনাংশ, আরুনাচল, দেবাশীষ, জয়দীপ, কল্যানব্রত, সুনীলবরণ, তিমির বরণ, তমোনাশ, শিখা, কুমকুম, দীপা, রাণু, তপতী, করুনা ইত্যাদি, ব্যক্তির অর্থ-হীন নাম পঞ্চাশ বছর আগে ও রাখা হত। যেমন খড়্গ রায়, শুধু পাল ইত্যাদি। অধুনা অর্থহীন নাম একেবারে অবলুত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

শিশুর জন্মের একশত আশী দিন পরে সাধারনত: ভাতছোঁয়া অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানটি রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভাতছোঁয়া অনুষ্ঠানে শিশুর মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেওয়া হয়। অবস্থাপন্ন জোতদার অথবা 'পাঢ়োই' ভাতছোঁয়া অনুষ্ঠানটি করে থাকেন। দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা একেবারেই সম্ভব হয় না।

— মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ —

পশ্চিম বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে একমাত্র মুসলমান, মেচ ও গিরি সম্প্রদায় ব্যতিত অন্যান্য উপজাতি ও সম্প্রদায়ের লোকেরা মৃতদেহ দাহ করে থাকেন। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটলে রাজবংশী, মেচ, ভর, রাভা, গিরি বা যুগীরা সাময়িক ভাবে খাদ্য গ্রহণে বিরত হন। মৃতদেহ সাধারনতঃ বাসী করা হয় না। মৃত্যু ঘটলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা মৃতদেহকে তুলসী মঞ্চের সামনে রেখে দেন। পরে বাঁশের মাচায় শবদেহকে স্থাপন করে নদী তীরবর্তী শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

গ্রামের নামী লোকের মৃত্যুতে শবযাত্রায় খোল ও জোটতাল ব্যবহৃত হয়। শবদেহ পথে নামানো নিষেধ। শ্মশান যাত্রাকালে যে হরিবোল ধ্বনি শুরু হয়, চিতারোহন পর্যন্ত সেই ধ্বনি কিছু সময় পর পর ধ্বনিত হয়। অন্যান্য কাঠের সঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায় জিগা কাঠ ও চিতায় ব্যবহার করেন।

হিন্দুদের মত রাভা ও রাজবংশী দের চিতা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সাজানো হয়। মৃতের মাথা থাকে উত্তর দিকে। পিতা অথবা মাতার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ অথবা কনিষ্ঠ পুত্র মুখাগ্নি করে থাকেন। যিনি মুখাগ্নি করেন তাঁকে বলা হয় 'মুখাগুনিয়া'। সাধারনতঃ বারো দিন অশৌচ পালন করা হয়। এই সময় আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অশৌচ পালন কারীরা এই কয়দিন খই, চিড়া, দই, কলা, চিনি অথবা গুড় ভক্ষণ করতে পারেন। মৃত্যুর এগারো দিন পর মৃতের আত্মীয় — স্বজনেরা 'ঘাট ধর্ম' নামক একটি অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। তেরো দিন অতিবাহিত হলে শ্রাদ্ধ শুরু হয়। শ্রাদ্ধ কার্য সম্পাদন করেন কাশ্যাহার বা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। কোথাও কোথাও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রী শ্রেণীর ব্রাহ্মন ও উপস্থিত থাকেন।

এতদঞ্চলে পঁচিশ বছর আগেও মৃত্যুর লক্ষণ ওঝা বা রোজা নির্দেশ করতেন। রাভা, মেচ ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে মৃত ব্যক্তি ধরাধাম ত্যাগ করে কৈলাস পর্বতে গমন করেন। শৈব ধ্যান ধারনা ও বিশ্বাস যে এতদঞ্চলের মাটিতে বৈষ্ণবীয় ধ্যান ধারনা প্রসারিত হবার অনেক আগে শিকড় গেড়েছিল, সে কথা প্রমাণিত হয়, 'মৃত্যুর পর আত্মার কৈলাস পর্বতে গমন' — এই বিশ্বাসের মাধ্যমে।

গারোদের মত মেচ উপজাতির মধ্যেও কবর ও দাহ এই দুই প্রথাই প্রচলিত আছে। মেচদের মধ্যে সুপ্রাচীন কালে দাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল না। দাহ করার প্রথা হিন্দু ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। দাহকার্যের সময় রোজার নির্দেশে মৃতের যে কোনো পুত্র তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে মুখাগ্নি করেন।

দাহ কার্য শেষে শুদ্ধিস্নান করা হয়।

মেচ উপজাতির মধ্যে একটি বিচিত্র প্রথা আছে। মৃত ব্যক্তির বাড়ীর উঠানে একটি মাটির ঢিবি তৈরী করা হয়। এর উপরে বাঁশের তৈরী একটি ঢাকনি বা বাঁপি থাকে। ঢাকনির ভিতরে প্রত্যেক দিন খাবার দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে জল-ও দেওয়া হয়। অনেকে সাত থেকে আটদিন, আবার অনেকে দশ থেকে এগারো দিন পর্যন্ত এই নিয়মটি পালন করে থাকেন। মেচ উপজাতির বিশ্বাস, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির স্থান পরিবর্তন করেন মাত্র। কাজেই ইহজগৎ থেকে অন্য জগতে গেলেও তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা সমান থাকে। সেই কারনে মৃত্যুর পরেও মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্য ও জলদান করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গারোদের মধ্যেও অনুরূপ একটি প্রথা আছে। মৃতদেহকে কবর দেওয়া অথবা দাহ করার পর জীবিত মানুষের জীবন ধারনের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় সেই সব উপকরন কবর অথবা চিতার পাশে রেখে দেওয়া হয়। যেমন চাল +, মদ, থালাবাটি, কাপড় +, প্রদীপ ও আলো জ্বালাবার সরঞ্জাম, দা ইত্যাদি। গারোদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পরেও মৃত ব্যক্তি অন্য জগতে এগুলি ব্যবহার করে। এই প্রথাকে গারো উপভাষায় বলা হয় 'দেলাং।'

মেচদের মধ্যে নবজাত শিশু থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের শিশুকে মৃত্যুর পর কবর দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য +, গারোদের মধ্যে বসন্ত কলেরা, কুষ্ঠ অথবা ঐ জাতীয় কঠিন রোগে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয়। অন্যথায় গারোদের মধ্যেও দাহ প্রথা প্রচলিত আছে। আত্মহত্যাকারী অথবা হিংস্র পশুর দ্বারা নিহত মেচ ব্যক্তিকে দাহ না করে কবর দেওয়া হয়।

রাজবংশী সম্প্রদায়ে শ্রাদ্ধে 'ধুমালি' নামক একটি অনুষ্ঠান পালিত হয়। মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে পরম পিতা ভগবানের নামকীর্তন করা হয়। ধুমালি অনুষ্ঠানে। শ্রাদ্ধকালীন এই নামকীর্তনকেই বলা হয় ধুমালি।

এতদঞ্চলের গিরি সম্প্রদায় মৃতদেহ দাহ করেন না। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিকে পদ্মাসন অথবা জোড়াসন করে কবরের মাঝখানে বসানো হয়। মৃতের মুখ থাকে উত্তর দিকে। মৃতদেহকে কখন ও মাটির উপর শুইয়ে দেওয়া হয় না। মৃতের দেহে থাকে যজ্ঞোপবীত। কবরে মাটি দেবার আগে মৃতদেহকে দেখে মনে হয় +, তিনি যেন ধ্যানরত সন্ন্যাসী। এই বিশেষ পদ্ধতিতে কবরস্থ করার প্রথা একমাত্র গিরি সম্প্রদায়ের মধ্যেই বোধহয় দেখা যায়।

— সখাহালা বা বন্ধুয়ালা —

আনুষ্ঠানিক ভাবে দুই ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের নাম সখাহালা বা বন্ধুয়ালা। প্রধানতঃ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত প্রথাটি প্রচলিত। বন্ধুত্ব-স্থাপন দূর গ্রামে বসবাস কারী কোনো কিশোর অথবা যুবকের সঙ্গে হতে পারে। আবার অতি নিকট প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতেও কোনো বাধা নেই।

'বন্ধুয়ালা' স্থাপনের সময় শপথ গ্রহণ করতে হয়। এই সময় উভয় পক্ষের 'সংগাড়া' উপস্থিত থাকেন। দুই বন্ধুর পিতৃ দ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তার নাম সংগাড়া।

বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা উভয় পক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে একটি শুভদিন দেখে অনুষ্ঠান কার্য শুরু হয়। দুই কিশোর বা যুবকের জন্য একটি বিশেষ আসন পেতে দেওয়া হয়। আত্মীয় স্বজনেরা ভিতরবাড়ীর চৌহদ্দীতে নির্দিষ্ট স্থানে বসেন। অনেকে এই সময় আরাধ্য গৃহদেবতার পূজা দিয়ে থাকেন। অধিকারী বা ব্রাহ্মণ দুই বন্ধুর সামনে উপস্থিত হন এবং সখ্যভাব যাতে চিরদিন বজায় থাকে, জগদীশ্বরের কাছে সেই প্রর্থনা জানানো হয়। অধিকারী বা বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেন, " আখিবা পারিবো ? " অর্থাৎ " বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারবি তো ?" উভয়েই সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ে। এর পর উভয় সংগাড়া ও আত্মীয় স্বজন বন্ধুদ্বয়কে সাধ্যানুযায়ী উপহার প্রদান করে থাকেন।

বন্ধুয়ালা একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দূরের মানুষকে আপন করে কাছে টেনে নেওয়া হয়। একবন্ধুর বিপদে অন্য বন্ধু সাহায্যের জন্য ছুটে যায়। সখাহালা স্থাপনের পর বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে উভয়কেই ছুটে যেতে হয়। কুমারী মেয়েরাও তাদের সখী নির্বাচন করে 'ভাদাভাদি' অনুষ্ঠানটি পালন করে থাকে। দে পদবী ধারী হিন্দুরা যেমন ভাবে কার্তিক পূজার কয়েকসপ্তাহ আগে পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ধানের বীজ পুঁতে রাখেন, ভাদাভাদি অনুষ্ঠানে ও অনুরূপ ভাবে শষ্যবীজ পুঁতে রাখার প্রথা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত রয়েছে। বীজ থেকে চারা বের হলে ভাদাভাদি অনুষ্ঠান-টি পালিত হয়।

" স্নানাদি সমাপন করিয়া লাল পাড় শাড়ী পরিধান করিয়া কিশোরী দুইটি নূতন পিঁড়ি বা কোনে আসনে পাশাপাশি বসে। আগন্তুকা কিশেরীটির হাতে তীর ধনুক দেওয়া হয়। পূজারীর নির্দেশ মত সে অপর মেয়েটিকে বলে, " বিআওর পর যদি স্ব-আমিক কুনজরে দেখিস, তে, এই তীর দিয়াঁ তোর চখুৎ হান দিস।" ইহার পর তীর ও ধনুকটি যে বাড়ীতে অনুষ্ঠান হইতেছে ঐ বাড়ীর মেয়েটির হাতে দেওয়া হয়। পূজারীর নির্দেশ মত আগন্তুকা কিশোরী—

-টিকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহাকে ও পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিতে হয়। ..... ভাদাভাদি অনুষ্ঠান কেবল স্বীয় সমাজের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ থাকে না। যে কোনো বর্ণের সঙ্গে সই পাতানো চলে।" [১৪]

:: গ্রন্থপঞ্জী ::

১। রাজবংশী অভিধান – শ্রীকলীন্দ্রনাথ বর্মণ। পৃষ্ঠা- ২।

২। আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি – বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী, পৃষ্ঠা :১১৬।

৩। ভারতে বিবাহের ইতিহাস – ডঃ অতুল সুর। পৃষ্ঠা- ৭৫।

৪। আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি – বিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী। পৃষ্ঠা :৭৬।

৫। রাজবংশী অভিধান – কলীন্দ্রনাথ বর্মণ। পৃষ্ঠা - ১০৬।

৬। মধ্যভারতে কোলজাতিদের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে কনের বাড়ীর উঠানে একটা মন্ডপ তৈরী করা হয়। মন্ডপটিকে' মাড়ওয়া' বলা হয়।' ভারতে বিবাহের ইতিহাস – ডঃ অতুল সুর। পৃষ্ঠা : ১৮।

৭। ভারতে বিবাহের ইতিহাস – ডঃ অতুল সুর। পৃষ্ঠা – ১২।

৮। লেখকের জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত তোতাইগছ গ্রাম নিবাসী শ্রীসমার রায় নামক জনৈক বৃদ্ধের মুখে শ্রুত।

৯। ভারতে বিবাহের ইতিহাস – ডঃ অতুল সুর। পৃষ্ঠা - ১৫।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও' সাগাই' শব্দটি প্রচলিত আছে। এর অর্থ' আত্মীয়' বা বন্ধুর বাড়ীতে ভোজ অথবা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে উপস্থিত হওয়া।

১০। The Meches and the Totos of North Bengal - Charu Chandra Sanyal. P. 35.

১১। ভারতে বিবাহের ইতিহাস – ডঃ অতুল সুর। পৃষ্ঠা ১৬।

১২। ভারতে বিবাহের ইতিহাস – ডঃ অতুল সুর। পৃষ্ঠা - ১২৭।

১৩। অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি – নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা - ৩৩।

১৪। উত্তরবঙ্গে ~~ভারতবর্ষে~~ রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ – ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়। পৃষ্ঠা – ১২৮।

*****